গুয়ান্তানামোর ডায়েরি

‘দয়া করে পাঁচ মিনিটের জন্য আসুন’
কিন্তু তাদের এই পাঁচ মিনিট শেষ হতে লেগেছিল
২৬টি মাস

গুয়ান্তানামোর ডায়েরি

[জিকরায়াত মু'তাকাল মিন জোয়ান্তানামো]

হোসাইন আবদুল কাদির

[গুয়ান্তানামো কারাগারের মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী
ড. আবদুল্লাহ আজজামের ভ্রাতুষ্পুত্রের জবানবন্দি]

নাজমুস সাকিব অনূদিত

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...

উৎসর্গ

ড. আবদুল্লাহ আজজাম; আধুনিক যুগেও যিনি ছিলেন
প্রতিযুদ্ধের শিক্ষক
এবং
আমি বন্দী থাকাকালে মারা যাওয়া আমার ছেলে
আবদুল্লাহ; তাঁদের দুজনের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে

–হোসাইন আবদুল কাদির

এই বইয়ের অনেক কথা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না, অনেকে মনে করবেন– এ সবই অতিকথন মাত্র। কিন্তু আমি এসব প্রত্যক্ষ করেছি এবং এসব ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছে। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে– 'যে শোনে সে তার মতো নয়, যে দেখেছে'।

ভূমিকা

গুয়ান্তানামোর লেখক হোসাইন আব্দুল কাদের–তাঁর পরিচিতিমূলক উপনাম আবু আব্দুল্লাহ আল-বলখি। গুয়ান্তানামো থেকে মুক্তির বেশ কিছুদিন পর আরবি ভাষায় তিনি বইটি লিখেছিলেন। মূল বইয়ের নাম 'জিকরায়াত মু'তাকাল মিন জোয়ান্তানামো'। ২০০৯ সালে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের আল-আবিকান প্রকাশনী থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হলে আরববিশ্বে এটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

বইটিতে বিনা দোষে আটক হওয়ার পর থেকে মুক্তি পর্যন্ত কারাগারের চার দেয়ালের ভেতর দিনযাপনের নানা স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন লেখক। বর্তমানে তিনি জর্ডানে বসবাস করছেন। বইটি পড়লে পাঠক লেখকের গ্রেফতার এবং গ্রেফতার পরবর্তী দৃশ্যপট ও নানা ঘটনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

একই সাথে জানতে পারবেন, শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন মানুষকে কীভাবে দীর্ঘ আড়াই বছর গুয়ান্তানামোর ভয়াল কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। শুধু এ বইয়ের লেখকই নন, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 'ওয়ার অন টেরর' শুরু হওয়ার পর এমন শত শত মুসলিম ব্যক্তিকে বিনা দোষে বছরের পর বছর ধরে আটকে রাখা হয় পৃথিবীর নাম না জানা অসংখ্য কারাগারে। হয়তো আজও অনেকে বিনা দোষে পঁচে মরছে পশ্চিমাদের বেনামী জিন্দানখানায়।

এ বই–সেই সব নির্দোষ ব্যক্তিদের পক্ষে কিছুটা হলেও পৃথিবীর সামনে সত্য উচ্চারণ করবে।

পাকিস্তানে গ্রেপ্তার

২০০২ সালের মে মাসের কথা। তখন আমি পাকিস্তানে থাকি। পেশোয়ারের হায়াতাবাদে আমার বাসা। একদিন এশার নামাজ পড়ে বাসায় ফিরেছি। পরিবারের সবাই রাতের খাবার সামনে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তখন গরমের মৌসুম। এশার নামাজ পড়তেই ১০টা বেজে যায়। তাই বাসায় ফিরে সবার সঙ্গে খেতে বসলাম। তৃতীয় লোকমা মুখে দিয়েছি, এমন সময় বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। আমার ১২ বছর বয়সী ছোট ছেলে ইবরাহিম দরজা খুলে দিয়ে এসে ভয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে 'কী হয়েছে' জিজ্ঞেস করতে না করতে দেখি ছয়-সাতজন পুলিশ আমাদের বাসায় ঢুকে পড়েছে।

আমি সামনে গিয়ে বললাম, 'আপনারা কী চান?'

তারা বলল, 'আবু আবদুল্লাহ বলখি কে?'

আমি বললাম, 'আমিই। কী চান বলুন!'

এক পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের সঙ্গে থানায় চলুন। আপনার সঙ্গে কথা বলব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনি ফিরে আসবেন।'

আমি তখন কিছুটা শক্তভাব দেখাই। তাদের জিজ্ঞেস করি, আমার কী অপরাধ? আমি বৈধভাবে পাকিস্তানে বসবাস করছি। আমার জর্ডানি পাসপোর্ট আছে। তা ছাড়া জাতিসংঘ থেকে পাওয়া কার্ড রয়েছে আমার। আমি সেটি বের করে তার হাতে দিই। অফিসার কার্ডটি দেখে তার পকেটে রেখে দেয়।

এরপর বলে, 'চলুন। আপনাকে যেতে হবে।'

আমি একটু শক্ত হয়ে বলি, 'কেন থানায় যাব?'

লোকটি চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'চলুন!' এরপর তার ইশারায় অন্যরা আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

আমার সঙ্গে সেদিন তারা আমার ছেলে মুহাম্মদকে গ্রেপ্তার করে। মুহাম্মদের বয়স তখন ১৮। সে সবেমাত্র উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে

ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছিল। মুহাম্মদকেও আমার সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলা হয়।

বের হয়ে দেখি, বাসার সামনে পুলিশভর্তি একটি সাদা পাজেরো। ওই গাড়ির দরজার সামনে একজন লোক দাঁড়ানো ছিল, যার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে পশ্চিমা কোনো দেশের নাগরিক। তার সঙ্গে তার মতো একজন নারী ছিল। আমাকে গাড়িতে তোলার পরপরই তারা গাড়িতে ঢোকে। তাদের সঙ্গে একদল পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল।

অনেক পরে আমি জেনেছি, সেদিন তারা আমার স্ত্রী ও কন্যাদের একটি ঘরে আটকে রাখে। তারপর সারা ঘর তল্লাশি করে। আমাদের বাড়ির দ্বিতীয় তলায় থাকতেন এক প্রতিবেশী। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। কয়েকজন পুলিশ দরজা ভেঙে তাঁদের বাসায় ঢুকে পড়ে এবং লুটপাট শুরু করে। প্রতিবেশীর স্ত্রীর গহনা কিংবা ঘরের দামি জিনিস–কিছু তারা বাদ রাখেনি।

গাড়িতে ওঠার পর গাড়ি স্টার্ট দিল। একজন পুলিশের কাছে জানতে চাইলাম, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

সে বলল, 'মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আপনাকে থানায় নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এরপর আপনি ফিরে আসবেন।' একজন পুলিশ কাপড় দিয়ে আমাদের দুই চোখ বেঁধে দিল। এরপর আমরা আর কিছুই দেখতে পাইনি। কোথায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটিও আর জানতে পারিনি।

প্রায় ২০ মিনিট পর একটি থানার সামনে পৌঁছালাম। আমাদের দ্রুত নামিয়ে দেয়। আমি কোথায় আছি এবং আশপাশে কে আছে, বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু চোখ বাঁধা থাকায় সম্ভব হলো না। যখন এক গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাদের অন্য গাড়িতে তোলা হলো, তখন দেখতে পাই আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহকেও তারা ধরে এনেছে। হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

আমাকে গ্রেপ্তারের আধঘণ্টা পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাসার সামনে থাকা পুলিশ তাকে ধরে আনে। আবদুল্লাহ বাইরে ছিল। ঘরে ফেরার পর যখন তারা জানতে পারে সে আমার ছেলে, তখন তাকে নিয়ে আসে। আবদুল্লাহ আগে থেকে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ছিল। পুলিশ কর্তাদের সে অনুরোধ করে, সে অসুস্থ এবং তার নিয়মিত বিশ্রাম ও ওষুধের প্রয়োজন। কিন্তু অনেক আকুতির পরও সেদিন তাদের মন গলল না।

আমাকে গ্রেপ্তারের কারণে ছেলেটি ভেঙে পড়ে। তা ছাড়া পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় অনেক দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে।

গ্রেপ্তারের পরদিন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পর থেকে তার অসুখ বাড়তে শুরু করে। কয়েকবার ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয় এবং ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে সে পড়াশোনা ছেড়ে পুরোপুরি বিশ্রাম গ্রহণ করে।

আমার পরিবার পাকিস্তান ছেড়ে জর্ডানে চলে যায়। সেখানে ছেলেটি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর ছয় মাস পর আবদুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আল্লাহ আমার প্রিয় পুত্রকে জান্নাতবাসী করুন!

আমি এবং আমার দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়ি আবার চলতে শুরু করে। কোথায় যাচ্ছিলাম আমরা তখন বলতে পারি না। বড় একটি গেটের সামনে গাড়িটি এসে পৌঁছাল। আমাদের চোখের বাঁধন খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে প্রত্যেককে আলাদা কামরায় রাখা হলো। হাতের বাঁধন খুলে একজন পুলিশ এসে আমাদের সঙ্গে থাকা সবকিছু নিয়ে নিল।

জেলে ঢোকার পরপর আমার জীবনের নানা ঘটনা মনে হতে থাকে। স্মৃতিপটে নানা দৃশ্য ভেসে উঠতে থাকে।

শুনেছি, মানুষের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে এবং মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়, তখন তার পুরো জীবনের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন তার কাছে জীবনটা অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। মনে হয়, এই পৃথিবীতে খুব অল্প সময় পেয়েছে। আমারও তখন এমন হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, জীবন শেষ মুহূর্ত হয়তো ঘনিয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি আমার মৃত্যু না হলেও জেলখানায় থাকাকালে আমি একরকম মরেই গিয়েছিলাম। জেলের বাইরের জীবনের তুলনায় জেলের ভেতরের জীবন কবরের মতোই। শুধু পার্থক্য এটাই যে কবরে গেলে আর পৃথিবীতে ফেরত আসা যাবে না। কিন্তু জেলে সেই আশা মনে উঁকি দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

জেলখানায় আমাদের ময়লা একটা বিছানা দেওয়া হলো। তাতেই একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। ঘুম হলো না। বিছানা ছিল দুর্গন্ধযুক্ত, আবহাওয়াও ছিল অনেক উত্তপ্ত।

মধ্যরাতের পর কয়েকজন পুলিশ মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহকে নিয়ে আমার কাছে এল। তারা জানাল, 'আপনার দুই ছেলেকে এখনই ছেড়ে দেওয়া

হচ্ছে। আপনি আগামীকাল ছাড়া পাবেন।' আমি আমার দুই ছেলেকে বিদায় জানালাম, তারা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আরও কজন পুলিশ এল। তাদের সঙ্গে ছয়জন আরব বন্দী। তাঁদের কয়েকজনকে আমি আগে থেকে চিনতাম।

তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সেই রাতে পাকিস্তানি পুলিশ আরও প্রায় ১০ জন আরবকে তাঁদের ঘর থেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের অনুমোদিত দাতব্য সংস্থায় কাজ করতেন। তাঁদের সবার বৈধ কাগজপত্র ছিল। আটককৃত ১০ জনের ৬ জনকে আমার সঙ্গে একই সেলে রাখা হয়। বাকিদের রাখা হয় অন্য জায়গায়।

পাকিস্তানে তখন গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া। এর সঙ্গে ময়লা, দুর্গন্ধময় সেল। সেলের ভেতর একটি বোতল ছিল, যাতে ছিল বাইরের একটি ট্যাপ থেকে আনা গরম পানি। এক কোণে ছিল একটি ছোট পাত্র, যা পেশাব করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। প্রতিদিন তিনবার বাথরুমে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। প্রতিদিন সকাল সাতটায়, জোহরের আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় ও সন্ধ্যায়। এ ছাড়া অন্য সময় প্রয়োজন হলেও বাথরুমে যাওয়ার সুযোগ ছিল না।

খাবার যা দেওয়া হতো, তা খুব নিম্নমানের এবং পরিমাণে অল্প। সকাল সাতটায় নাশতা দেওয়া হতো। তাতে থাকত পচা তেলে আধভাজা পরোটা আর ছোট্ট একটি কাপে দুধ চা। কখনো দুধ চা আরও এক কাপ দেওয়া হতো।

দুপুরে একটি ছোট শুকনো রুটি। সঙ্গে দেওয়া হতো টমেটো মেশানো ডাল। রাতের খাবার সন্ধ্যা সাতটায়। ফল পাওয়া যেত না। ভাতের সঙ্গে সবজি কখনো কখনো পাওয়া যেত। আর সপ্তাহে এক দিন ছোট্ট এক টুকরো মাংসের তরকারি, যাতে কেবল গোশতের সামান্য ঘ্রাণ পাওয়া যেত। সপ্তাহে এক দিন গোসল করার সুযোগ দেওয়া হতো। সাবান, গোসলের বালতি বা গোসলখানা কোনো কিছু ব্যবহারযোগ্য ছিল না। প্রচণ্ড গরমে সারা দিন শরীর থেকে ঘাম ঝরত। ছোট্ট একটি পাখা যদিও ছিল কিন্তু লোডশেডিংয়ের কারণে অধিকাংশ সময় সেটি নিথর হয়ে থাকত।

পেশোয়ারের এই জেলখানায় আমি ১১ দিন ছিলাম। এই কয়েক দিনে মাত্র দুবার আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রথমবার যেদিন আমরা জেলে এসে পৌঁছাই, সেদিন বিকেলে। আমাদের চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে কোথাও নিয়ে যায়। এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যার কথা তখন জানতে পারিনি বা

আগেও কোনো দিন জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাদের একটি হলরুমে ঢোকানো হয়।

বিরাট হলরুমে একটি টেবিলে কিছু কাগজপত্র ছিল। এগুলো বিভিন্ন বন্দীর কাছ থেকে তল্লাশি করে পাওয়া গেছে। টেবিলে কয়েকজন পাকিস্তানির সঙ্গে আরও কয়েকজন পুরুষ ও নারী বসা ছিলেন। দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা আমেরিকান।

আমরা সবাই ঢোকার পর একজন নারী মুচকি হেসে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন। এরপর অফিসাররা আমাদের সবাইকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তেমন কিছু তারা প্রথম দিন জানতে চায়নি। শুধু নাম, জন্মস্থান ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেয়। প্রথম দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আগের মতো করে আমাদের পেশোয়ার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

দ্বিতীয়বার সবাইকে একসঙ্গে নেওয়া হয়নি। আগের জায়গায় দুজন করে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমবার দেখা হওয়া অফিসারদের মধ্যে একজন খুব ভালো আরবি জানত। সে সবার সঙ্গে কথা বলত। নয় দিন পর আমার পালা এল। কয়েকজন পুলিশ আমার সেলে এসে আমার হাত ও চোখ বেঁধে গাড়িতে তোলে। এরপর গাড়ি দিয়ে নিয়ে আসে সেই আগের জায়গায়। সেই আরবি জানা অফিসার আমার কাছে আমার জীবনবৃত্তান্ত শুনতে চাইল। আমি তার সামনে বসে আমার জীবনের ফিরিস্তি দিতে শুরু করলাম।

আমার নিজের কথা

সেই আরবি জানা পশ্চিমা অফিসার প্রথমে আমার কাছে আমার জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মজীবন এবং পাকিস্তানে আমার ১৯৮৫ থেকে ২০০২ পর্যন্ত লম্বা সময় অবস্থানের কারণ জানতে চাইল। আমি তাকে একে একে সব বললাম।

আমার জন্ম হয়েছিল ১৯৫৯ সালে ফিলিস্তিনের সায়লা গ্রামে। আমার বাবা-মা দুজনই ফিলিস্তিনি। আমরা দুই ভাই, দুই বোন। আমি সবার ছোট। প্রায় ১০ বছর আগে আমার মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আবার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় ঘরে দুই মেয়ে ও এক ছেলের জন্ম হয়। আমার বাবা একজন মধ্যবিত্ত মানুষ ছিলেন। ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আমি গ্রামে পড়াশোনা করেছি। দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠে আমাদের শহর জেনিনের এক মাদ্রাসায় ভর্তি হই এবং সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করি। মাধ্যমিকে পড়ার বছর বৃত্তি পেয়ে চলে যাই সৌদি আরবে।

সৌদি আরবের জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করি। জামিয়াতুল ইমামে অধ্যয়নরত সময়ে দুই বছর আমি সৌদি আরবের দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদের অধীনে ফিলিস্তিনে দায়ী হিসেবে কাজ করেছি। মাস্টার্স শেষ করে ১৯৮২-৮৩ সালে আমি জন্মভূমি ফিলিস্তিনে চলে যাই। এক বছর আমি কোথাও চাকরি বা কিছু করিনি। এরপর কিছুদিন জামিয়াতুল খলিলে শিক্ষকতা করি।

১৯৮৫ সাল থেকে পাকিস্তানে বসবাস করছি। এখানে আমি আফগান ও আরবদের মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছি। ফিলিস্তিনে ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছিল। তখন আমি এবং আমার মতো হাজারো মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

জামিয়াতুল খলিলে শিক্ষকতার সময়ই বিভিন্ন দেশে চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। অবশেষে আমি পাকিস্তানে চলে

আসি। এখানে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁর কাছে শুনেছি, পাকিস্তানে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, যাদের আরব শিক্ষক প্রয়োজন। তাঁর কথাতেই আমি পাকিস্তানে আসতে আগ্রহী হই। পাকিস্তানের এ অঞ্চলে অনেক আফগান বসবাস করেন। এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলোতে আফগান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশি।

ফিলিস্তিন থেকে সপরিবারে এসে প্রথমে আমি পেশোয়ারে 'জামিয়াতুদ দাওয়াহ ওয়াল জিহাদ'-এ যোগদান করি। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি পেশোয়ারের মূল শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে শরণার্থী শিবিরে অবস্থিত। আফগান ছেলেরা এখানে পড়ত। এখানে আমি এক বছর ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশি দূরে বলে এক বছর পর আমি চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে মাহাদুল মুআল্লিমিনে যোগদান করি। এটি ছিল কুয়েত সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি বিশেষায়িত শিক্ষায়তন।

এর অফিস আমার বাসার কাছে ছিল এবং বেতনও বেশি ছিল। এরপর আমি যোগ দিই মাআদুল আনসার আল আলিতে। এটি ছিল সৌদি আরবের রাবেতা আল ইলমিল ইসলামি পরিচালিত সংগঠন। এই সংস্থায় কাজ করার সময় আমি প্রতি গ্রীষ্মের (চার মাসের) ছুটিতে আফগানিস্তানের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতাম এবং ফিরে এসে আবার এখানে যোগ দিতাম। এ সময় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে।

এসব স্বেচ্ছাসেবকের প্রায় সবাই ছিল আরব তরুণ, যারা রুশ আফগান যুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে এসেছিল। এরা মূলত যুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে সেবা ও পুনর্বাসনমূলক কাজ করত। এসব স্বেচ্ছাসেবককে পরিচালনা ও এদের কার্যক্রম দেখভাল করত একটি সংস্থা। আমি এই সংস্থার অফিসে কাজ করতাম। আমার কাজ ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের পোশাক, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি বণ্টন করা।

স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ সেবামূলক। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের এতিম সন্তান, বিধবা ও পঙ্গু হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় প্রচুর বিদেশি সংস্থা আফগানদের জন্য কাজ করত। এর মধ্যে পশ্চিমা দেশের সংস্থা যেমন ছিল, তেমনি আরব ও এশীয় অনেক সংস্থা ছিল। আমি যে সংস্থায় কাজ করতাম, সেটি অনেক বড় সংস্থা ছিল। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এই সংস্থার কার্যক্রম চলত। এই সংস্থার অধীনে অনেক শরণার্থী শিবির, স্কুল, কলেজ,

হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চলত। এর মাঝে কিছুদিন আমি কোনো চাকরি করতে পারিনি।

এর কারণ খুলে বলি।

রুশ-আফগান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপর আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এ সময় আফগানিস্তানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আসা আরবদের জন্য সেখানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ঠিক এই সময় আমার পাসপোর্টের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। নতুন পাসপোর্ট বানানোর জন্য আমি অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু চলমান সংকটের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফিলিস্তিনে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা ইসরায়েলি অবরোধও তখন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে সেখানে পাসপোর্ট নবায়নের চেষ্টা করি। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়।

এই সময়টা আমার জন্য ছিল খুবই কঠিন একটা সময়। আমার পক্ষে কোনো চাকরি করাও তখন সম্ভব ছিল না। আবার পাকিস্তানে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা মানে ছিল নিশ্চিত গ্রেপ্তার। সবশেষে ১৯৯২ সালে আমি জাতিসংঘের কর্মীদের কাছে গিয়ে আমার ঘটনা খুলে বলি। তারা আমার সব কথা শুনে এবং কাগজপত্র দেখে আমাকে পাকিস্তানে তাদের শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করে। আমাকে মাসিক ১৫০ ডলার ভাতা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো শরণার্থী মাসিক ভাতা পেলেও পাশাপাশি অন্য কিছু করতে পারে। তাই ১৯৯৪ সালে পেশোয়ারে জামিয়াতুল উলুম ওয়াতাকানিয়া ইসলামি একাডেমিতে শিক্ষকতা শুরু করি। এটি ছিল সৌদি আরবের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে আমি এক বছর ছিলাম। এরপর আমি মাহাদুল আনসার আল-ইলমিতে যোগ দিই। এটি ইয়েমেনের আল-মাআহিদুল ইলমিয়্যাহর অধীনে পরিচালিত। পাকিস্তানে নিযুক্ত ইয়েমেনি রাষ্ট্রদূত এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। ২০০১ সাল পর্যন্ত আমি এই প্রতিষ্ঠানে ছিলাম।

২০০১ সালে ইয়েমেন সরকার আল-মাআহিদুল ইলমির অধীনে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত তাদের সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। এর পর থেকে আমি বেকার বসে ছিলাম। নতুন কোনো চাকরির সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। এর মধ্যেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই অফিসারের সামনে বসে একনাগাড়ে আমি আমার জীবনের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে গেলাম। এত লম্বা

কথা বলতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার কথা শেষ করলাম।

এটি ছিল পাকিস্তানে আমার শেষ জিজ্ঞাসাবাদ। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করেছি, সেখানে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি ইংরেজি এবং সাধারণ বিষয়ও পড়ানো হতো। প্রচলিত নিয়মের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল এসব। নিছক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না।

সব বলে শেষ করার পর আমি অফিসারের কাছে জানতে চাইলাম আমাকে গ্রেপ্তারের কারণ কী? অফিসার খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিল, 'সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। এ জন্যই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে? অফিসার খুব শান্তভাবেই বলল, 'অচিরেই তা জানতে পারবেন।' সেদিনের জিজ্ঞাসাবাদ এখানেই শেষ হলো। এরপর আমাকে চোখ বেঁধে পিকআপে করে আগের জায়গায় নিয়ে গেল।

১১ দিন পর কয়েকজন পুলিশ আসে আমাদের সেলে। কিছু কাগজ দিয়ে বলে, 'তোমাদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আরও সহজে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই তোমরা তোমাদের পরিবারকে লিখে জানাতে পারো।' সেদিনই এশার নামাজের পর একদল পুলিশ এসে আমাদের হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে চোখও বেঁধে ফেলে। আমাদের একটি পিকআপে তুলে দেয়।

পিকআপে তোলার পরপরই পুলিশ সদস্যরা আমাদের জড়িয়ে ধরে এবং বলতে থাকে, আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো। আমাদের গলা জড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করে এবং বলে, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা বাধ্য হয়ে তোমাদের তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। তোমাদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

তাদের এ কথা শুনে আমাদের বোঝার বাকি রইল না যে, আমরা ইসলামাবাদে যাচ্ছি না। আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার ধারণা একটু পরই সত্য প্রমাণিত হলো। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো পেশোয়ার বিমানবন্দরে। একটু একটু করে বিমানের শব্দ এগিয়ে আসছিল। আমাদের নিয়ে গাড়িটি একটি বিমানের পাশে থামল। বন্দীদের বিমানবন্দরের মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হলো। একেকজনের নাম ধরে ডাকা হচ্ছিল।

আমার নাম ডাকা হলে আমি সামনে গেলাম। এক পুলিশ আমার চোখের বাঁধন খুলে দিল। বিমানের দরজায় পাকিস্তানি পুলিশ আমাকে আমেরিকান সৈন্যদের হাতে অর্পণ করল। হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে লোহার শক্ত হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বিমানের ভেতর আমাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো পেছনের দরজা দিয়ে। শুরু হলো এক নিরুদ্দেশ যাত্রা।